বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৩৩ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২২

স্বয়ম্ভরতার স্বপ্ন ও তথ্য বিভ্রাট

মাহবুব হোসেন*
আবদুল বায়েস**

১। দুধ ও বিড়ালের গল্প

বাংলাদেশে খাদ্য বিশেষ করে চাল উৎপাদন নিয়ে সবসময় বিতর্ক ছিল এবং এখনো আছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিতর্কটি বেশ জমে উঠেছে বলেই বর্তমান নিবন্ধের অবতারণা করা হলো। বিতর্কের বিষয় হচ্ছে চাল উৎপাদনে উদ্বৃত্ত বনাম ঘাট্‌তি। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, চালের উৎপাদন সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে এবং অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পর চালের উদ্বৃত্ত আছে। যদি তাই হয়ে থাকে, স্বয়ম্ভরতা অর্জনের এই খবরটি নিঃসন্দেহে একটা সুসংবাদ। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের কারো কারো মতে, বাস্তবে চালের কোনো উদ্বৃত্ত নেই। যারা বলছেন উদ্বৃত্ত নেই তাদের যুক্তি অনেকটা যেন পুরনো সেই গল্পের পথ ধরেই প্রতিষ্ঠিত: বাটির দুধ যদি ঘরের বিড়াল পান করে থাকে তো বিড়ালের ওজন পূর্ববর্তী দেড় কেজির চেয়ে বেশি হবার কথা; আর যদি তা না হয়ে থাকে (এবং যদি ইতোমধ্যে অন্য কেউ সে দুধ পান না করে থাকে) সেক্ষেত্রে অবশ্যি বাটিতে দেড় কেজি পরিমাণ দুধ থাকার কথা। একইভাবে, বাংলাদেশ যদি চাল উৎপাদনে উদ্বৃত্ত থেকে থাকে তা হলে কেন চাল আমদানি করা হচ্ছে, কেন চালের মূল্য বাড়ছে ইত্যাদি প্রশ্ন আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে যায়। সুতরাং এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যে উদ্বৃত্ত বনাম ঘাটতি নিয়ে বিতর্কটি আবাহন করা। তবে তার আগে পুরো বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা চাষের জমির পরিমাণ সংক্রান্ত পরস্পরবিরোধী তথ্য দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটানো যেতে পারে।

২। কৃষি জমি নিয়ে বিতর্ক

মানুষের জীবন-জীবিকা নির্বাহের জন্য যে সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের প্রয়োজন তার মধ্যে জমি হচ্ছে সবচাইতে দুর্লভ সম্পদ। আর পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম জনঅধ্যুষিত এই বাংলাদেশে জমির পরিমাণ যে বিরাজমান মানব মহাসমুদ্রে এক ফোঁটা বিন্দুর মতো, তা কারো অজানা থাকার কথা নয়। প্রায় ১৬ কোটি মানুষের প্রধান খাবার চাল উৎপাদিত হয় মাত্র ৯০ লাখ হেক্টর জমিতে। সময়ের বিবর্তনে কৃষি জমির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে বলে আমরা জানতে পারি এবং কী কী কারণে সেটা ঘটছে তার ব্যাখ্যা একটু পরেই দেয়া হবে। বর্তমানে প্রতিটি কৃষক পরিবার (খানা) গড়পড়তা মাত্র প্রায় চার বিঘা জমির মালিক (০.৪৮ হেক্টর)। তবে ভূমিহীন পরিবারের হিসাব বিবেচনায় নিলে গড়পড়তা জমির মালিকানা দাঁড়ায় তিন বিঘার মতো। এর সাথে অন্যের কাছ থেকে বর্গা নেয়া জমি হিসাব করলেও গড়পড়তা আকার বড়জোর পাঁচ বিঘা হবে। বস্তুত এমন এক ক্রান্তিকালে কাঁটা ঘায়ে

---

* ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালকের কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা এবং বিভাগীয় প্রধান, অর্থনীতি ও সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
** পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড ইভালুয়েশন ডিভিশন (আরইডি), ব্র্যাক, ঢাকা।
প্রবন্ধটি রিভিউ করে দেয়ার জন্য লেখকদ্বয় জনৈক রিভিউয়ারের নিকট কৃতজ্ঞ।

নুনের ছিটার মতো চাষযোগ্য জমি হারাবার বেদনা মিশ্রিত সংবাদটি শুনতে হয়। টেলিভিশন টকশো, পত্রিকার প্রতিবেদন কিংবা কৃষি গবেষকের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা থেকে সবার মনে এখন বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে যে বাংলাদেশ প্রতি বছর ১ শতাংশ হারে চাষকৃত জমি হারায়। অর্থাৎ প্রতি বছর প্রায় ৮০ হাজার হেক্টর চাষের জমি বেহাত হচ্ছে। যদি ধরে নেয়া হয় যে ৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি খানার সারা বছরে খাদ্য প্রবাহ নিশ্চিত রাখতে ন্যূনতম তিন বিঘা জমি থাকা প্রয়োজন, সেই ক্ষেত্রে এই জমি হারানোর ফলে প্রতিবছর ১০-১৫ লাখ লোকের খাদ্য নিরাপত্তা নষ্ট হচ্ছে বলে ধরে নেয়া যায়। সুতরাং এটাই বাস্তব যে এই দুঃসংবাদটিতে আমাদের সবার 'চক্ষু দুইটা ছানাবড়ার মতো বিস্ফারিত' এবং একই সাথে গলা শুকিয়ে যাবার মতো অবস্থা। স্বভাবতই তখন উদ্বেগাকুল প্রশ্ন দাঁড়ায়: তাহলে বাংলাদেশ কি একদিন কৃষি-জমি শূন্য হয়ে পড়বে? ফসল উৎপাদনের জন্য জমি আসবে কোত্থেকে? কী হবে খাদ্য নিরাপত্তার? ইত্যাদি।

এমন ভয়ঙ্কর ভবিষ্যদ্বাণী এবং আতংকগ্রস্ত প্রশ্ন সামনে রেখে আমরা কিছু তথ্যের দিকে দৃষ্টি দেবার প্রয়াস নেব। তবে আগে তথ্যের উৎস নিয়ে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। জাতীয় পর্যায়ে কৃষি ও খাদ্য সংক্রান্ত উপাত্ত আসে প্রধানত চারটি উৎস থেকে: (ক) কৃষি শুমারি যা বেশ ক'বছর পর প্রকাশ করা হয়; (খ) স্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ারবুক (এখন থেকে শুধু ইয়ারবুক) যা প্রতিবছরের পরিসংখ্যান উপস্থাপন করে; (গ) বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক জাতীয়ভাবে প্রতিনিধিত্বশীল বিভিন্ন নমুনা নিয়ে পরিচালিত খানা পর্যায়ের সমীক্ষা; এবং (ঘ) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানাভিত্তিক আয়-ব্যয় সমীক্ষা। স্বাভাবিকভাবেই কৃষি সংক্রান্ত অতি সাম্প্রতিক তথ্য পাবার আশায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইয়ার বুক ব্যবহারে বেশ উৎসাহ দেখা যায়। যাই হোক, তথ্য বিভ্রাট এবং ভয়ংকর ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষিতে আপাতত এই মুহূর্তে আমাদের আলোচনায় থাকবে সরকারি সংস্থা কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য অর্থাৎ কৃষি শুমারি ও ইয়ারবুক।

৩। হিসাব এবং শোনা সেই গল্প

এদেশে সরকারি যেকোনো তথ্যের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হলো এর গ্রহণযোগ্যতা। সাধারণত ধারণা করা হয় যে সরকারের তথাকথিত ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার পক্ষে প্রায়শই সরকারি সংস্থাগুলো তথ্য দাঁড় করাবার প্রচেষ্টা চালায় বলে গোঁজামিল থাকার প্রবণতা থাকে বেশি। এ প্রসঙ্গে পাঠককে বহুল প্রচলিত একটা চুটকির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া যেতে পারে। একটা চাকরির জন্য একজন গণিতজ্ঞ, একজন হিসাবরক্ষক ও একজন অর্থনীতিবিদ সাক্ষাৎকার দিতে হাজির হন। 'দুইয়ের সঙ্গে দুই যোগ করলে কত হয়'– এই প্রশ্নের উত্তরে গণিতজ্ঞ বললেন, 'চার' আর হিসাবরক্ষক বললেন, 'দুইয়ে দুইয়ে চার হয় তবে মাঝে মাঝে ৫ অথবা ১০ শতাংশ এদিক-সেদিক থাকতে পারে'। সবশেষ প্রার্থী অর্থনীতিবিদ। তিনি প্রশ্ন শোনামাত্রই চেয়ার ছেড়ে তার বিপরীতে বসা প্রশ্নকর্তার কাছে চলে যান এবং তাঁর কানে ফিসফিস করে উল্টো প্রশ্ন ছুড়ে দেন: "স্যার, আপনি কত হলে খুশি হন?"। যাক সে কথা।

২০০৮ সালের কৃষি শুমারিতে দেখানো হয়েছে যে ধান উৎপাদনে ব্যবহৃত মোট জমির পরিমাণ প্রায় ১ কোটি হেক্টর, প্রতি হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয় ৩.৭৭ টন এবং সেই সুবাদে বছরে মোট উৎপাদিত ধানের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩ কোটি ৯৪ লাখ টন বা চালের হিসাবে ২ কোটি ৬২ লাখ টন।

অপরপক্ষে ইয়ারবুক অনুযায়ী একই বছরে ধান উৎপাদনে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ ১.১ কোটি হেক্টর, হেক্টর প্রতি উৎপাদনমাত্রা ৪.১৬ টন এবং সেই মতে মোট ধানের উৎপাদন দাঁড়ায় প্রায় ৪ কোটি ৭০ লাখ টন বা চালের হিসাবে ৩ কোটি ১৫ লাখ টন (সারণি ১)। দেখা যাচ্ছে যে, সরকারি এ দুটো উৎস থেকে পাওয়া তথ্যের জমি এবং উৎপাদিত মোট ধানের পরিমাণের ক্ষেত্রে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। ব্যাপারটা এমন দাঁড়ায় যে, কৃষি শুমারি অনুযায়ী চাল উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ম্ভরতার প্রায় তীরে পৌঁছে গেছে অথচ ইয়ারবুক অনুযায়ী ইতোমধ্যে দেশটি স্বয়ম্ভরতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। তাই শুরুতে যে প্রশ্নটি তোলা হয়েছিল সে প্রশ্নটিই যেন ঘুরে ফিরে আসছে: স্বয়ম্ভরতা অর্জনের সংবাদ যদি সত্যি হয়ে থাকে, তবে ফি–বছর চাল আমদানি করা হচ্ছে কেন এবং কোন যুক্তিতে উদ্বৃত্ত চাল রপ্তানি করে কৃষকের আয় বৃদ্ধি করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে না? অন্যদিকে আমন ধান বিবেচনায় নিলে জমিসংক্রান্ত পরিসংখ্যানের অসঙ্গতিটা অধিকতর দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। কৃষি শুমারিতে আমন ধানের জমি দেখানো হয়েছে প্রায় ৪৮ হাজার হেক্টর অথচ ইয়ারবুক বলে ৫৫ হাজার হেক্টর। আমাদের অনুমান, এক সময়ের ডিপ-ওয়াটার আমনের গুরুত্ব প্রবলভাবে হ্রাস পাওয়া এবং তার জায়গায় পুকুরে মাছ চাষের বিস্তারের তথ্য কৃষি শুমারিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অথচ সেই তথ্য ইয়ারবুকে নথিভুক্ত হয়নি বলেই ব্যবধানজনিত বিপত্তি ঘটছে (সারণি ১ ও পরিশিষ্ট ১)।

সারণি ১

শস্য উৎপাদনে জমি ব্যবহারের উপাত্ত, ২০০৮

শস্য	কৃষি শুমারি, ২০০৮			স্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ারবুক		
	জমি ('০০০ হেক্টর)	ফলন (টন/হেক্টর)	মোট উৎপাদন ('০০০ টন)	জমি ('০০০ হেক্টর)	ফলন (টন/হেক্টর)	মোট উৎপাদন ('০০০ টন)
আউশ	৯৮৩	২.৪৯	২,৪৪৮	১,০৬৫	২.৬৬	২,৪৮৩
আমন	৪,৭৭৪	২.৭৮	১৩,২৭১	৫,৫০০	৩.১৭	১৭,৪২০
বোরো	৪,৬৯৮	৫.০৪	২৩,৬৭৮	৪,৭১৮	৫.৬৬	২৬,৭১৪
মোট ধান	১০,৪৫৬	৩.৭৭	৩৯,৪১৯	১১,২৮৬	৪.১৬	৪৬,৯৭৮
গম	২৬৮	২.২২	৫৯৫	৩৯৫	২.১৫	৮৪৯
ভূট্টা	১৮২	৪.৯৯	৯০৮	১২৮	৫.৭০	৭৩০
পাট	৩৫৪	১.৯৩	৬৮৩	৪২০	১.৯৯	৮৩৫
ইক্ষু	৮২	২৫.৯	২,১২৪	১২৬	৪১.৫	৫,২৩৩
ডাল	৪৬৬	০.৯০	৪১৯	২২৭	০.৮৭	১৯৮
তৈলবীজ	৫০৪	১.১৪	৫৭৪	২৩৪	৯৭৪	২২৮
গোল আলু	৩৩৯	১১.৫৯	৩,৯২৯	৪০৪	১৩.০৪	৫,২৬৮

উৎস: হোসেন (২০১২)।

আবার চাষকৃত জমির পরিমাণ নিয়েও যেন বিভ্রান্তের বেড়াজাল থেকে বেড়িয়ে আসা সম্ভব হচ্ছে না। ১৯৯৬ সালের কৃষি শুমারিতে মোট চাষকৃত জমির পরিমাণ দেখানো হয়েছে প্রায় ৮১ লাখ হেক্টর, যা ১৯৮৩-৮৪ সালের শুমারিতে ছিল প্রায় ৯২ লাখ হেক্টর। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, ১৯৮৩-৮৪

থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত কৃষি জমি কমেছে প্রতিবছর প্রায় ১ শতাংশ হারে। সম্ভবত এই প্রবণতাই সবার জন্য উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে থাকছে। কিন্তু ২০০৮ সালে কৃষি শুমারি থেকে সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা গেল, বাংলাদেশে মোট কৃষি জমির পরিমাণ হচ্ছে ৮৯ লাখ হেক্টর যা ১৯৯৬ সালের শুমারির হিসাবের চাইতে বেশি। এখন ১৯৮৩-৮৪ থেকে ২০০৮ সময়কাল বিবেচনায় নিলে দেখা যাবে যে প্রতিবছর কৃষি জমি হ্রাস পেয়েছে ০.১৩ শতাংশ হারে, যা চলমান হিসাবের চাইতে বেশ কম (সারণি ২)। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, চাষকৃত জমির পরিমাণ আর যাই হোক অন্তত ১ শতাংশ হারে হ্রাস পাচ্ছে না এবং আশা করা যায়, এই সুসংবাদটি উদীয়মান উদ্বেগ উপশমের একটা মোক্ষম উত্তর হতে পারে।

সারণি ২

হারানো ভূমি-সম্পদের হিসাব, ১৯৮৩-৮৪ থেকে ২০০৮

উৎপাদন	কৃষি শুমারি			পরিবর্তন (%, বছর)	
	১৯৮৩-৮৪	১৯৯৬	২০০৮	১৯৮৩-৯৬	১৯৮৩-০৮
খামারের সংখ্যা ('০০০)	১০,০৪৫	১১,৭৯৮	১৪,৮৭১	১.৩	১.৯
নিজস্ব জমি ('০০০ হেক্টর)	৮,৯৭৯	৭,৭০৩	৭,৯৩২	-০.৯	-০.৪
খামারের মোট চাষকৃত জমি ('০০০ হেক্টর)	৯,১৮৩	৮,০৮০	৮,৮৮৫	-১.০	-০.১৩
বসত ভিটার জমি ('০০০ হেক্টর)	৩৩২	৪১৪	৫৮৯	২.০	২.৯
নিট চাষকৃত জমি ('০০০ হেক্টর)	৮,১৫৩	৭,১৮৫	৭,৬০৭	০.৯	-০.৩
নিট ফসলকৃত জমি ('০০০ হেক্টর)	৭,৭০৮	৬,৬৫৮	৭,০৬০	-১.১	-০.৩
মোট ফসলকৃত জমি ('০০০ হেক্টর)	১৩,১৫৫	১১,৫৮৫	১২,১৯১	-১.০	-০.৩
খামারের আকার (হেক্টর)	০.৯১	০.৬৮	০.৬০	-	-

উৎস: কৃষি শুমারি ১৯৮৩-৮৪, ১৯৯৬ এবং ২০০৮।

২০০৮ সালের কৃষি শুমারিতে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে কি তাহলে বুঝতে হবে যে চাষকৃত জমির নিম্নমুখী প্রবণতা থেমে গেছে অথবা নতুন করে জায়গা জাগছে – যেমন করে নদীর একূল ভাঙে তো ওকূল গড়ে? এ ব্যাপারে আমাদের ব্যাখ্যা দু'টি। প্রথমত, জীবন নির্বাহের চাপে খানাগুলো পতিত জমি এমনকি বসতভিটার কিয়দংশ অব্যাহতভাবে চাষে নিয়োজিত রাখছে বলে দিনে দিনে হিসাব পাল্টে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, উপকূলীয় অঞ্চলে নতুন জমি জেগে ওঠেছে অথবা পলিতে পূর্ণ জলাধার থেকে জমি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। আমাদের প্রথম অনুমানটির সমর্থনে ভূমির ব্যবহার সম্পর্কিত আলোচনায় এই আলামত পেয়েছি যে এক সময়ে বসতভিটা কিংবা বাড়ির নিচু জমি চাষ করা হতো না, ইদানিং তা চাষের আওতায় আনা হয়েছে। তাছাড়া মাছচাষ কিংবা বাগানের জন্য জমির বরাদ্দ বেড়েছে (হোসেন ও বায়েস ২০০৯)। দ্বিতীয় অনুমানটিকে সমর্থন করে অর্থমন্ত্রীর দেয়া ২০১২-১৩ সালের বাজেট ভাষণ। অর্থমন্ত্রী জানান দিয়েছিলেন যে, প্রায় ১৫ লাখ জমি পুনরুদ্ধারকল্পে সরকার ইতোমধ্যে

বিনিয়োগ করেছে এবং যদি যথাযথভাবে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় তাহলে পুনরুদ্ধারকৃত জমির পরিমাণ দাঁড়াবে বর্তমানের মোট চাহিদাকৃত জমির ২০ শতাংশ। যাই হোক, একটা খামারে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ ১৯৮৩-৮৪ সালে গড়পড়তা ০.৯১ হেক্টর থেকে ২০০৮ সালে ০.৬০ হেক্টরে নেমে যাবার তথ্য থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং খানা ভাগ হয়ে যাবার ফলে খামারের আয়তন ক্রমাগত সংকুচিত হয়ে আসছে। এছাড়া বড় জোতের মালিক জীবিকার জন্য সম্পদ কৃষি থেকে অকৃষিজ খাতে স্থানান্তর করছে ঠিকই কিন্তু তারা জমি বিক্রি করছে না; ঐ জমি তারা কৃষি শ্রমিক বা প্রান্তিক চাষী দিয়ে চাষ করাচ্ছে। ফলে গ্রাম-শহর দ্রুত অভিবাসন সত্ত্বেও বাংলাদেশে খামারের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে – যার সংখ্যা ১৯৮৩-৮৪ সালের ১ কোটি থেকে এখন দেড় কোটি (হোসেন ২০১২)।

এবার জমি সংক্রান্ত হিসাবের অন্য একটা উৎসের দিকে দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (এসআরডিআই) প্রদত্ত জমির হিসাব বিভিন্ন সময়ে স্যাটেলাইট ম্যাপ থেকে নেয়া। এই সূত্র ধরে দেখা যায়, মোট কৃষি জমির পরিমাণ ৯৫ লাখ হেক্টর আর এর বিপরীতে বিবিএস ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) হিসাবে তা প্রায় ৯১ লাখ হেক্টর। সুতরাং এসআরডিআই ও ডিএইর হিসাবের মধ্যে জমি সংক্রান্ত পার্থক্য ৪ লাখ হেক্টর। তার মানে, এই দুই সূত্রে শুধু উফ্‌শি বোরো ধানের উৎপাদনে পার্থক্য ঘটার কথা প্রায় ২২ লাখ টন! এক্ষেত্রে অবশ্য প্রতিষ্ঠানগুলো উপাত্ত কী উপায়ে সংগ্রহ করেছে সেটা মাথায় রাখতে হবে। যেমন, এসআরডিআই এরিয়াল ফটোগ্রাফ ও গ্রাউন্ড ট্রুথিং (মৃত্তিকা সমীক্ষা) পর্যালোচনা এবং তার সাথে দ্বিতীয় উৎস থেকে পাওয়া বিভিন্ন তথ্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা শেষে প্রায় দশ বছরের (সাইকেল) একটা হিসাবে উপনীত হয়। অন্যদিকে ডিএই প্রতিটি ইউনিয়নে নিযুক্ত উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তা মারফত তথ্য সংগ্রহ করে থাকে।

স্যাটেলাইট ইমেজারি ব্যবহার করে দেখা যায়, ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশে মোট কৃষি জমি ছিল ৯৮ লাখ হেক্টর, ২০০০ সালে ৯৪ লাখ হেক্টর এবং ২০১০ সালে ৮৮ লাখ হেক্টর। এই হিসাবে ১৯৭৬-২০০০ সময়ে প্রতি বছর কৃষি জমি হ্রাস পেয়েছে ০.১০ শতাংশ হারে আর ২০০০-২০১০ সময়কালে ০.৪৯ শতাংশ হারে। তবে ২০০০-২০১০ সময়কালে ৭টি বিভাগের মধ্যে শুধুমাত্র চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে প্রতি বছর কৃষি জমি হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ১.৩ শতাংশ ও ১.১ শতাংশ হারে, যা প্রচলিত ধারণার মধ্যেই পড়ে। এবং এটা বোধ হয় ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই যে, অধিকতর নগরায়ণ, অবকাঠামো সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে সব বিভাগেই ১৯৭৬-২০০০ সময়কালের চাইতে পরবর্তী সময়কালে অধিকহারে কৃষি জমি খোয়া গেছে (পরিশিষ্ট ১-৪)। যাহোক এসআরডিআই থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে প্রথম সময়কালে প্রতি বছর কৃষি জমি খোয়া গেছে ১৩,৪১২ হেক্টর এবং দ্বিতীয় সময়কালে ৬৮,৭০০ হেক্টর।

লক্ষ করবার বিষয় আরও যে, বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত কৃষি শুমারি জমি হারানোর ভিন্নতর হিসাব দেয়। এক হিসাবে দেখা যায়, ১৯৮৩–৮৪ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত সময়ে প্রতিবছর চাষের জমি কমছে ৮০,০০০ হেক্টর হারে, যা মোট জমির এক শতাংশ। এই হিসাবটা এখন নীতি নির্ধারকদের বক্তৃতায় শোনা যায়। কিন্তু ২০০৮ সালে পরিচালিত কৃষি শুমারির তথ্য বলছে, বাংলাদেশের জমি ৮৮ লাখ হেক্টর, যা ১৯৯৬ এর তুলনায় প্রায় ৮ লাখ হেক্টর বেশি। অর্থাৎ ১৯৯৬–২০০৮ সময়ে চাষকৃত জমির পরিমাণ প্রতিবছরে বেড়েছে প্রায় ৬৬,০০০ হাজার হেক্টর হারে (বছরে প্রায় ০.৮ শতাংশ হারে)। জমি

বাড়ার ক্ষেত্রে একমাত্র কারণ হতে পারে নোয়াখালী উপকূলের সদ্য জাগা চর চাষের আওতায় আনা কিন্তু এই জমি কৃষি শুমারি দেয়া তথ্যের তুলনায় অনেক কম। তবে কম করে হোক আর বেশি করে হোক, চাষের জমি যে ক্রমাগত কমছে সেটাই এখন বাস্তবতা এবং নানাবিধ কারণে তা হয়তো আগামী দিনগুলোতেও অব্যাহত থাকবে। এই প্রবণতা নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক কেননা আমাদের দেশে খাদ্য নিরাপত্তা হচ্ছে প্রধান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা। আরও মনে রাখতে হবে যে, এমনিভাবে কৃষি জমি হারালে আগামী ১০ বছরের মধ্যে ৮০ লাখ লোকের খাদ্য সরবরাহের প্রধান উৎস হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক একটা প্রশ্ন: হারিয়ে যাওয়া কৃষি জমি কোথায় যাচ্ছে? প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে জানা যায় যে, ১৯৭৬-২০০০ সময়ে গ্রামীণ বসতি খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে বলে স্বভাবতই গ্রামীণ বসতি বৃদ্ধিকল্পে সবচেয়ে বেশি কৃষি জমি চলে যাচ্ছে। যেমন, ঢাকা বিভাগে প্রতিবছর ১৬,২৬৬ একর জমি খোয়া যায় গ্রামীণ আবাসনের জন্য (পরিশিষ্ট ১-৪) অথচ প্রথাগত ধারণা হচ্ছে মূলত অবকাঠামো ও শিল্পের জন্য কৃষি জমি অধিকহারে চলে যাচ্ছে। মোট কথা, নগরায়ণ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, আবাসন প্রকল্প ইত্যাদি কারণে চাষযোগ্য জমির ওপর চাপ সৃষ্টি অব্যাহত আছে এবং ভবিষ্যতেও হয়তো এই চাপ আরও তীব্র হবে। অতএব বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এ অবস্থা থেকে অবশ্যই পরিত্রাণ দরকার এবং তার জন্য চাই: (ক) অকৃষিজ স্বার্থে জমির অর্থনৈতিক ব্যবহারের পরিকল্পনা করা; (খ) উন্নয়ন প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণে অপচয় রোধ করা; (গ) উপকূলীয় অঞ্চলে মৌসুমভিত্তিক পতিত জমির ব্যবহার নিশ্চিত করা; (ঘ) ভূমিহীনদের জন্য চরের জমি বরাদ্দ দেয়া; এবং (ঙ) বঙ্গোপসাগর থেকে জমি পুনরুদ্ধারের চলমান প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

৪। উদ্বৃত্ত এবং উদ্ভট উট

এবার চালের মোট উৎপাদনের পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে যে তথ্য বিভ্রাট রয়েছে সে সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। সরকারি তথ্য অনুযায়ী চাল উৎপাদনে বাংলাদেশ মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, কিছুটা উদ্বৃত্ত। কিন্তু ২০০৮ সালে পরিচালিত কৃষি শুমারি থেকে পাওয়া আমন ধানের জমির পরিমাণ সরকারি পরিসংখ্যানের ব্যবহৃত তথ্যের চাইতে ১০ লাখ হেক্টর কম। যদি সেটা সত্য হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রকৃত চাল উৎপাদন সরকারি ঘোষণার চাইতে ২৫ লাখ টন কম হবার কথা। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আর কিছু না হোক অন্তত প্রধানত নীতি প্রণয়নের খাতিরেই পরিসংখ্যান ব্যুরোর বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া তথ্য সংক্রান্ত অসংলগ্নতা দূর করা উচিত।

শুরুতে উল্লেখ করেছিলাম যে, অতি সম্প্রতি চাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্তের প্রসঙ্গটা বেশ বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) ইউনুস ও অন্যান্য (২০১২) কর্তৃক পরিচালিত একটি সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, বছরের পর বছর দেখানো চালের উৎপাদনের সরকারি হিসাব কিছুটা স্ফীত এবং ২০১২ সালে এই স্ফীতির মাত্রা ছিল ৪২ লাখ টন! চালের ভোগ মাত্রার ক্ষেত্রে দেখা যায়, বাস্তবে একজন মানুষ যতটুকু খায় সরকারের দেয়া হিসাবের চাইতে তা ১৩ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে অপচয়, বীজ ও পশুখাদ্যের জন্য ব্যবহৃত খাদ্যশস্যের অনুপাত ১৫ শতাংশ কিন্তু সরকারি সূত্রে প্রদর্শিত হয় ১০ শতাংশ। সব কিছু হিসাবে নিলে দেখা যায় চাহিদার তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ মাত্র ৬ লাখ টন বেশি, যা সরকারি হিসাবে প্রায় ৩৯ লাখ টন।

সারণি ৩

চাল উদ্বৃত্তের হিসাবের তারতম্য, ২০১২

(মিলিয়ন টন)

উৎপাদন	বিবিএস	বিআইডিএস
মোট উৎপাদন	৩৫.৭	৩৪.৪
নিট উৎপাদন	৩২.১	২৬.৭*
মোট ভোগ	২৭.৩	২৬.১
উদ্বৃত্ত	৪.৮	০.৬

উৎস: ১. বিবিএস: স্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ারবুক; ২. ইউনুস ও অন্যান্য (২০১২)।

টীকা: *উপরোক্ত ১৪ শতাংশের সাথে জমির পরিমাণ ও ফলনের তারতম্যের জন্য ৯ শতাংশ এবং জমির প্রকৃত পরিমাপ বনাম কৃষকের মৌখিক হিসাবের তারতম্যের জন্য ২ শতাংশ বাদ দেয়া হয়েছে।

এক্ষেত্রে সৃষ্ট প্যারাডক্সটি প্রণিধাণযোগ্য। যদি সরকারি তথ্য সঠিক হয়ে থাকে (অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ উৎপাদন দিয়ে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়েও কিছু চাল হাতে থাকে) তা হলে কেন এত বেশি খাদ্য আমদানির প্রয়োজন। যেমন, ২০০৯-১০ সালে ৩৪ লাখ টন আমদানি। বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া তথ্য পরীক্ষা এবং আড়াআড়ি নিরীক্ষা শেষে বিআইডিএস এই উপসংহারে পৌঁছায় যে, উৎপাদনমাত্রার ক্ষেত্রে খুব একটা পার্থক্য না থাকলেও হিসাবকৃত ব্যবধানের পেছনে কাজ করেছে ফসলের আওতায় দেখানো জমির পরিমাণ। সরকারি হিসাব মতে অপচয়, বীজ ও পশুখাদ্য বাবদ ব্যয় হয় ১০ শতাংশ, বিআইডিএস মনে করে বাস্তবে তা চালের জন্য ১৪ শতাংশ এবং গমের জন্য ১৫ শতাংশ (প্রতিবেশি দেশ ভারতে নাকি এই অনুপাত ১২.৫ শতাংশ)। এই ব্যবহারগুলোতে কম দেখানো মানে দাঁড়ায় খাদ্য লভ্যতার পরিমাণ বেশি। তাছাড়া বিআইডিএস মনে করে যে ইদানিং ঘরের বাইরে খাবার প্রবণতার হিসাব অন্তর্ভুক্ত না করাটাও বিবিএস হিসাবের অন্যতম একটা দুর্বল দিক। যেমন, বিবিএস এর হিসাব মতে ২০১০ সালে প্রতিদিন একজন ব্যক্তির খাদ্য ভোগের পরিমাণ ৪১৬ গ্রাম, কিন্তু বিআইডিএস এর মতে সেটা হবে ৪৬২ গ্রাম। আবার সম্ভবত ধান চাষের আওতায় জমি দেখাতে গিয়ে এই দুই উৎসের মধ্যে বড় ব্যবধান ধরা পড়ে যায়।

আমাদের মতে, আমনের আওতায় দেখানো জমি বেশি ধরে নিলেও সরকারি উৎস থেকে প্রাপ্ত অপচয়, পশুখাদ্য ও বীজ বাবদ দেখানো তথ্য সঠিক নয়। তবে বিআইডিএস কর্তৃক প্রদর্শিত ভোগ ও ভোগের আয়-স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ ঠিক নয় এবং এক্ষেত্রে নমুনা হিসেবে সম্ভবত বড় চাষীদের ব্যবহার করা হয়েছে বলে এমনটি ঘটেছে। সুতরাং বিআইডিএস চালের উদ্বৃত্তকে যত খাটো করে দেখছে বাস্তবে উদ্বৃত্ত তত খাটো নয়, আবার সরকার উদ্বৃত্ত যত বড় করে দেখাচ্ছে সেটাও তত বড় নয়। উদ্বৃত্ত হয়তো আছে তবে তা খুব ক্ষীণ যাকে বলে রেজর থিন মারজিন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, সরকারি হিসাবে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ৩০-৪০ লাখ টনের অংক অত্যন্ত উঁচুর দিকে এবং এমন উদ্বৃত্ত বাস্তবসম্মতও নয় কেননা এই হিসাবে প্রতিবছর মাথাপিছু ভোগের পরিমাণ দাঁড়ায় ২০০ কেজি যা পৃথিবীর কোথাও নেই। তাছাড়া এমনকি বিবিএসের খানাভিত্তিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব দেখাচ্ছে যে, গড়পড়তা বার্ষিক মাথাপিছু চালের ভোগের মাত্রা ১৬০ কেজি। তাই চালের উদ্বৃত্তের এই উদ্ভট হিসাব দেখে কবি শামসুর রাহমানের বিখ্যাত কবিতার শিরোনাম 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ' সম্ভবত একটু ঘুরিয়ে বলা যায়, "উদ্ভট এক উদ্বৃত্তের উটের পিঠে চলেছে বাংলাদেশ!"

গ্রন্থপঞ্জি

BBS (Bangladesh Bureau of Statistics), *Census of Agriculture and Livestock, Vol. 1 to Vol. 6, 1983-84*, BBS, Dhaka.

——*Census of Agriculture, Vol. 1 to Vol. 3, 1996*, BBS, Dhaka.

——*Census of Agriculture, Vol. 1 to Vol. 3, National Series, 2008*, BBS, Dhaka.

——*Statistical Yearbook*, Various Years, BBS, Dhaka.

Hossain, M. (2012): *Transformation of Agrarian Structure in Bangladesh: Insight from Reports of Agricultural Census*, Presentation for a Policy Dialogue on the Tenant Farmers Development Project in Bangladesh, organized by BRAC Research and Evaluation Divisions, BRAC Centre, 14 November.

Hossain, M. and A. Bayes (2009): *Rural Economy and Livelihoods Insights from Bangladesh*, AH Development Publishing House.

Ministry of Agriculture (2007): *Yearly Book of Agricultural Statistics*.

National Food Policy Capacity Strengthening Programme (2012): *Trends in the Availability of Agricultural Land in Bangladesh*, FAO.

SRDI (Soil Resource Development Institute) (2010): *Land and Soil Statistical Appraisal Book of Bangladesh*.

Yunus, M., Quazi Shahabuddin, Mustafa K. Mujeri, M. Asaduzzaman, Nazneen Ahmed, Monzur Hossain, Siban Shahana and Morshed Alam (2012): "Reflections on Selected Puzzles of Bangladesh Food Economy," mimeo, Bangladesh Institute of Development Studies.

পরিশিষ্ট ১

জমির ব্যবহারের তথ্য

(হেক্টর)

ভূমি ব্যবহারের ধরন	বছর			বার্ষিক পরিবর্তন	
	১৯৭৬	২০০০	২০১০	১৯৭৬-২০০০	২০০০-২০১০
কৃষি	৯৭,৬১,৪৫০	৯৪,৩৯,৫৪১	৮৭,৫১,৯৩৭	-১৩,৪১২	-৬৮,৭৬০
গ্রামীণ বসতি	৮,৮৫,৬৩৭	১৪,৫৮,৩০৩	১৭,৬৬,১২৩	+২৩,৮৫০	+৩০,৮০৯
শহর ও কল-কারখানা	২৬,৭৯৯	৪৭,৪৯৫	৮৪,৬১৬	+৮৬২	+৪,০১২
পতিত জমি	২,৭১,১৬৯	২,৮২,৭৮১	৫,৪৭,১২৮	+৪৮৪	+২৬,৪৩৫
বন	১৭,৫৪,৯১৭	১৩,১১,১২১	১৪,৩৪,১৩৬	-১৮,৪৯১	+১২,৩০১
ম্যানগ্রোভ বন	৪,৫২,৪৪৪	৪,৮৬,৭৯১	৪,৪১,৪৫৫	+১,৪৩১	-৪,৫৩৪
লবণাক্ত অংশ	১১,৭৮৯	২৪,৩০৬	৩৬,০২২	+৫২১	+১,১৭২
মৎস্যচাষ	৫৮২	১,৪৩,৫০৬	১,৭৫,৬৬৩	+৫,৯৫৫	+৩,২০৬

উৎস: এসআরডিআই (২০১০)।

পরিশিষ্ট ২

কৃষি জমির পরিবর্তন

বিভাগ	বছর			বার্ষিক পরিবর্তন (মোট জমি) (হেক্টর)		বার্ষিক পরিবর্তন (%)	
	১৯৭৬	২০০০	২০১০	১৯৭৬-২০০০	২০১০-২০১০	১৯৭৬-২০০০	২০০০-২০১০
ঢাকা	২৩,১৩,৭৫১	২৩,১২,৯৬১	২১,৬১,৬৫০	-৩৩	-১৫,১৩১	-০.০৩৪	-০.৬৫৭
চট্টগ্রাম	১৩,৬৬,৯৮৩	১৩,৬৫,৭৫৬	১১,৮৬,০৭৬	-৫১	-১৭,৯৬৮	-০.০০৪	-১.৩১৫
রাজশাহী	১৫,৫২,৫৫৮	১৪,৩৬,৩০৭	১২,৭৬,৮৬১	-৪,৮৪৪	-১৫,৯৪৫	-০.৩১২	-১.১১০
খুলনা	১৩,৩০,৪৮৫	১৩,২২,০৩৯	১২,৩৪,২২৯	-৩৫২	-৮,৭৮১	-০.০২৬	-০.৬৬৪
বরিশাল	৮,৪৪,১৪১	৮,২০,৬৭১	৪,১৪,০১০	-৯৭৮	-৬,৬৬১	-০.১১৬	-০.০৮১
সিলেট	৯,৪৫,৫০৬	৮,৩১,২২৭	৮,৩৯,৩৭১	-৪,৭৬১	+৮৪১	-০.৫০৪	+০.০৯৮
রংপুর	১৪,০৮,১৭৫	১৩,৫০,৭৩০	১২,৩৯,৭৬৮	-২,৩৯৩	-১১,০৯৬	-০.১৭০	-০.৮২১

উৎস: এসআরডিআই (২০১০)।

পরিশিষ্ট ৩

গ্রামীণ আবাসন পরিবর্তন (হেক্টর), ১৯৭৬-২০১০

বিভাগ	বছর			বার্ষিক পরিবর্তন (%)	
	১৯৭৬	২০০০	২০১০	১৯৭৬-২০০০	২০০০-২০১০
ঢাকা	২,২৫,৭৭৫	৩,৪৭,৬২০	৫,১৩,৮৭৫	+৫,০৭৮	+১৬,৬২৬
চট্টগ্রাম	১,৫৭,৬২৮	৩,৩২,০০৪	৩,৪৪,৩৩৭	+৭,২৬৬	+১,২৩৩
রাজশাহী	১,১৭,১৪২	১,৮৯,৯৪২	২,৬০,১৫৫	+৩,০৩৩	+৭,০২১
খুলনা	১,৩৯,৪০৪	১,৫১,৮১৯	১,৪৫,২৭৬	+৫১৭	-৬৫৪
বরিশাল	৫৮,৮৩৮	৯৩,৭৫২	৮৯,৮৯৫	+১,৪৫৫	-৩৮৬
সিলেট	৯০,৯৯১	১,৯৭,৭৫৮	২,১৭,১০৭	+৪,৪৪৯	+১,৯৩৫
রংপুর	৯৫,৮৫৯	১,৪৫,১১৪	১,৯৫,৫৫০	+২,০৫২	+৫,০৪৪

উৎস: এসআরডিআই (২০১০)।

পরিশিষ্ট ৪

নগর ও শিল্পের আওতায় জমির পরিবর্তন (হেক্টর), ১৯৭৬-২০১০

বিভাগ	বছর			বার্ষিক পরিবর্তন (%)	
	১৯৭৬	২০০০	২০১০	১৯৭৬-২০০০	২০০০-২০১০
ঢাকা	১০,১৯০	২২,৭৯৫	৪২,৭৪৭	+২৫২	+১,৯৯৫
চট্টগ্রাম	৮,৫৯৯	১৩,৩৬২	২১,০১২	+১৯৮	+৭৫৬
রাজশাহী	২,৩৯৩	২,৪২৬	৪,২২৩	+০৩	+১৭৮
খুলনা	১,৭২৭	২,৭৭৯	৫,২৬৪	+৪৪	+২৪৯
বরিশাল	৩৪২	৮৭	১,৮৪২	-১১	+১৭৫
সিলেট	২,৩৩৩	১,৬৫২	৬,৯৮০	-২৮	+৫৩৩
রংপুর	১,২১৭	৪,৩৯৫	৫,৫৪৯	+১৩২	+১১৫

উৎস: এসআরডিআই (২০১০)।